

## বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকার

সমাজ ও সামাজিক সমস্যা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সমাজ সৃষ্টির লগ্ন থেকেই সামাজিক সমস্যা ছিল, এখনও রয়েছে। শুধু সমস্যার প্রকৃতি ও ধরনের পার্থক্য ঘটেছে। সামাজিক সমস্যা হলো সমাজের এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা যা অধিকাংশ লোককে প্রভাবিত করে এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সকলকে একযোগে কাজ করতে হয়। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে জেনেছি। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অপরিমিত সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা কিংবা ভূমিকা পালনের ব্যর্থতাই সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। সমাজভেদে সামাজিক সমস্যার রূপ পরিবর্তিত হয়। বাংলাদেশে বহু সামাজিক সমস্যা রয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা সামাজিক নৈরাজ্য, মূল্যবোধের অবক্ষয়, নারীর প্রতি সহিংসতা, সড়ক দুর্ঘটনা এবং দুর্নীতি সম্পর্কে অবহিত হব।



### এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- সামাজিক সমস্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিরোধের পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে পারব;
- 'নারীর প্রতি সহিংসতা'- ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আইনের বিষয়বস্তু ও শাস্তি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিশুশ্রম ও কিশোর অপরাধের ধারণা, ধরন ও আইনি প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মাতৃকল্যাণ ধারণা ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারব;
- সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দুর্ঘটনা মুক্ত বা নিরাপদ সড়ক করার উপায় এবং দুর্ঘটনা হ্রাসের পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দুর্নীতির ধারণা, কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারব এবং আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হব;
- নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব এবং নারী নির্ধাতন প্রতিরোধে সচেতন হব;
- দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্ঘটনা বিষয়ে সচেতন হব,
- ধর্মীয় আদর্শে জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হব।

## পরিচ্ছেদ ১৫.১: সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয়

সাধারণভাবে সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও অসুবিধাজনক অবস্থা বা পরিস্থিতিকেই সামাজিক সমস্যা বলে। সামাজিক সমস্যা সাময়িক সময়ের জন্য সৃষ্টি হয় না। এটি কমবেশি স্থায়ী হয় এবং এর সমাধানের লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সুতরাং সামাজিক সমস্যা হলো সমাজ জীবনের এমন এক অবস্থা, যা সমাজবাসীর বৃহৎ অংশকে প্রভাবিত করে, যা অব্যাহত এবং এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য সমাজবাসী এককভাবে প্রচেষ্টা চালাতে উদ্যোগী হয়।

সামাজিক বৈষম্য এবং বিশৃঙ্খলা হতে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমাজের প্রচলিত আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, প্রথা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের ব্যতিক্রমই সামাজিক বিশৃঙ্খলা। সামাজিক বিশৃঙ্খলা তখনই দেখা দিবে যখন ব্যক্তির উপর সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব হ্রাস পাবে। সামাজিক রীতিনীতি যখন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন মানুষের নৈতিক অবনতি শুরু হয়। নৈতিক অবনতি ব্যাপক আকার ধারণ করলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙন শুরু হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙনের ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়।

সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হলো— অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, অপহরণ, আত্মহত্যা, নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, ঘুষ, ছিনতাই, সন্ত্রাস, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, স্বজনপ্রীতি, যৌন আচরণ, যৌনব্যথির প্রাদুর্ভাব, স্বেচ্ছাচার, শিশুশ্রম, শিশুদের প্রতি অবহেলা, হত্যা প্রভৃতি।

### সামাজিক নৈরাজ্যের ধারণা

সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপ হচ্ছে সামাজিক নৈরাজ্য। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র যখন আর কাজ করে না এবং শাসনযন্ত্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তখন সমাজে নৈরাজ্য দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ ঘুষ, নারী নির্যাতন, অপহরণ, যৌন আচরণ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।

### সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ধারণা

যে কোনো সমাজের রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত আচার-আচরণের সমন্বয়ে মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। বস্তুত যেসব ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার-আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর সমষ্টিই হলো মূল্যবোধ। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো, অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ, মায়া-মমতা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ। এসব মূল্যবোধের অবনতিই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। এর ফলে সৃষ্টি হয় সামাজিক অসংজ্ঞা।

### সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রভাব

সমাজ জীবনে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে মানুষের অধিকারের বধন বেড়ে যায়। ঘুষ, দুর্নীতিতে গোটা সমাজ অচল হয়ে পড়ে। অপরাধীদের দৌরাহা বেড়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ অপরাধী শাস্তি পায় না। সমাজ জীবনে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দেশের সকল সেবা খাতের মান নিম্নগামী হয়। সমাজে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বেড়ে যায়।

#### কাজ

দলগত : সমাজে মূল্যবোধের কয়েকটি অবক্ষয় চিহ্নিত কর এবং এর প্রতিরোধ পদক্ষেপ লেখ।  
একক : সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সামাজিক নৈরাজ্যের পার্থক্য উদাহরণের মাধ্যমে লেখ।



## সামাজিক নৈরাজ্য প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ

সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে—

- ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়ন;
- দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধে কর্মক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন;
- সমাজের হিংসাত্মক কার্যক্রম রোধে সচেতনতা সৃষ্টি;
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

## পরিচ্ছেদ ১৫.২ : নারীর প্রতি সহিংসতা

### নারীর প্রতি সহিংসতার ধারণা

পুরুষ বা নারী কর্তৃক যে কোনো বয়সের নারীর প্রতি শুধু নারী হওয়ার কারণে যে সহিংস আচরণ করা হয় তাই নারীর প্রতি সহিংসতা। কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি নানা অজুহাতে নারীর আর্থ-সামাজিক, প্রান্তিকতার সুযোগ নিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটিয়ে থাকে। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শারীরিক বা মানসিকভাবে এই নির্যাতন চালানো হয়। এ সহিংস আচরণ বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, কর্মক্ষেত্রে, হাট-বাজার থেকে শুরু করে যে কোনো স্থানে ঘটতে পারে।

### নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতি

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা নারীর স্বাধীনতা এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। নারীর প্রতি সহিংসতার নানা প্রকৃতি রয়েছে। নারীরা বাড়িতে শারীরিক ও মানসিক যেসব নির্যাতনের শিকার হয় তাকে বলে পারিবারিক সহিংসতা। সাধারণত স্বামী, শাশুড়ি, ননদ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য দ্বারা নারী এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। এসব সহিংসতার মধ্যে রয়েছে, খোঁটা দেওয়া, প্রহার, যৌতুক সম্পর্কিত নির্যাতন, শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকারের বঞ্চনা, অত্যধিক কাজের বোঝা চাপানো, কন্যা শিশুকে মারধর, নিপীড়ন প্রভৃতি।

যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও ধর্ষণ, মনগড়া ফতোয়া, এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশুপাচার প্রভৃতি হলো বর্বর, নির্মম সহিংসতা।

যৌন হয়রানি : সাম্প্রতিক সময়ে যৌন হয়রানি বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি নৈতিকতার চরম অবক্ষয়, একটি সামাজিক বিপর্যয়। নারীরা বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। বর্তমানে কিশোরী, তরুণী এমনকি বিবাহিত নারীও জঘন্য যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে।

যৌন হয়রানি মানে পুরুষ কর্তৃক নারীদের কর্মক্ষেত্রে, বাড়িতে, পাবলিক পরিসরে নারী-শিশুর প্রতি অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শ। যৌন হয়রানিকে ইভটিজিংও (Eve-Teasing) বলা হয়। ইভটিজিং (Eve-Teasing) শব্দটি যৌন হয়রানির ইংরেজি প্রতিশব্দ। ইভটিজিং (Eve-Teasing) হচ্ছে লোকসমাগমপূর্ণ স্থানে পুরুষ কর্তৃক নারীদের নিগ্রহ বা উত্ত্যক্ত করা। গৃহঅভ্যন্তরে, কর্মক্ষেত্রে অথবা বাতায়নের পথে, কখনোবা নিরিবিধি স্থানে অসং উদ্দেশ্যে অনৈতিক স্পর্শ স্থাপনের জন্য পুরুষ কর্তৃক নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়। অনেক সময় শিশুরাও যৌন হয়রানি ও নির্বাতনের শিকার হচ্ছে।

ফতোয়া : গ্রামীণ এলাকায় মনগড়া ফতোয়ার মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটানো হয়। কখনো কখনো গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ মনগড়া আইনের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করে। এসব দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী।

অ্যাসিড নিক্ষেপ : অ্যাসিড নিক্ষেপ নারীর প্রতি একটি ভয়াবহ সহিংসতা। বর্তমানে বাংলাদেশে অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণত নারীদের উপরই অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা অধিক ঘটে থাকে। প্রেম ও অনৈতিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, সম্মতি নিয়ে বিরোধ, পারিবারিক কলহসহ নানা কারণে অ্যাসিড নিক্ষেপের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটে।

নারী ও শিশু পাচার : নারী ও শিশুরা পাচার হয়ে নানাভাবে সহিংসতার শিকার হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় নারী ও শিশু পাচারের পরিস্থিতি ভয়াবহ। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর নারী ও শিশু পাচার হয়ে যায়। এদের বলপূর্বক বিভিন্ন অবমাননাকর এবং অমানবিক কাজ, যেমন- দেহ ব্যবসায়, উটের জকি ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় এসব পাচারকৃত নারী ও শিশুদের অজ্ঞপ্রত্যজ্ঞও বিক্রি করা হয়।

### নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ

সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার বহু কারণ রয়েছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন কাজে নারী সর্বদা অপারদর্শী অদক্ষ হিসেবে পরিগণিত হয়। ঘরের বাইরের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত রাখা, যৌতুক, বাধ্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাসন্তানের জায়গায় পুত্রসন্তানের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠা প্রভৃতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলেছে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা আমাদের দেশে যৌতুক প্রথাকে প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত করেছে। ক্রমে যৌতুকপ্রথা পরিণত হয়েছে সহিংসতার হাতিয়ার রূপে। তাছাড়া নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা, উদ্দেশ্যমূলক ফতোয়া, বিভিন্ন সামাজিক প্রথা প্রভৃতি নারীর প্রতি সহিংসতা উৎসাহিত করে।

এখনও আমাদের সমাজে অনেক পুরুষ নারীকে দুর্বল ও অবলা মনে করে। গ্রামীণ ও শহুরে সমাজের কতিপয় পরিবারে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি হলো নারীর কাজ গৃহে রান্না-বান্না, সন্তান জন্মদান, লালন-পালন, সবজি বাগান করা, গবাদিপশু পালন, শিশুকে পাঠদান, শারীরিক শূশ্রূষা করা প্রভৃতি।

পিতৃতান্ত্রিক অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি, যেমন-পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নারীরা স্বামীর সেবাদাসী, স্বামীর পদতলে স্ত্রীর বেহেস্ত প্রভৃতি মনোভাব থেকেই নারীর প্রতি সহিংসতার সৃষ্টি হয়। আবার শৈশবে নিজ পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বঞ্চনার অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে একজন পুরুষকে সহিংস করে তুলতে পারে। কন্যাসন্তানকে শিক্ষা দানের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া, কন্যা সন্তানের প্রতি মা-বাবার উদাসীনতা, পুত্রসন্তানকে প্রাধান্য দেওয়া, বিবাহে কন্যার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করার মনোভাব প্রভৃতি নারীর প্রতি সহিংসতাকে আরও একথাপ বাড়িয়ে দেয়।

দারিদ্র্য খোঁচাতে কাজের খোঁজে এসে অনেক নারী সহিংসতার শিকার হয়। বাংলাদেশে নারী শ্রমিকের একটা বিরাট অংশ পোশাকশিল্পে কাজ করে। এসব নারী শ্রমিক রাতে কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে বা শয়নকক্ষ সংকটের কারণে একই ঘরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বসবাস করার কারণে অনেকেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। এছাড়াও বাসাবাড়িতে কাজ করে এমন গৃহকর্মী নারী বা শিশু অনেকেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

লোকলজ্জা, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার ভয়সহ নানা কারণে বাংলাদেশের নারী সমাজ অনেক সময় নির্যাতনের বিষয় বাইরে প্রকাশ করতে বা প্রতিবাদ করতে পারে না। ফলে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংস ঘটনা আরও বেড়ে যাচ্ছে। তবে নারী ও শিশুর এ নীরবতা ভাঙতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থা, যেমন- আইন সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পুলিশের 'ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার', ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

### নারীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব

নারীর জীবনে সহিংসতার প্রভাব জটিল ও ভয়াবহ। নারীর প্রতি শারীরিক নির্যাতন কখনো কখনো নারীর অজাহানি ঘটায়। সহিংস ঘটনায় নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতবিক্ষত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নারী আত্মহত্যা পর্যন্ত করে থাকে। সহিংসতার শিকার নারীরা সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। নারীর প্রতি এই সহিংসতা আমাদের দেশের অর্থনীতিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

#### কাজ

একক : নারীর প্রতি সহিংসতা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে কীভাবে প্রভাব ফেলে তা পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের আদ্যোকে ব্যাখ্যা কর।

### নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আইনি প্রতিকার

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কতিপয় আইনি প্রতিকার হলো:

১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ (২০০৩ সালে সংশোধিত) যৌন হয়রানিকে শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে-‘যদি কোনো পুরুষ অযাচিতভাবে তার যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য নারী অবমাননা কিংবা অন্ত্রীল অজ্ঞাভঙ্গি বা ইজ্জিতের মাধ্যমে যৌন হয়রানিমূলক আচরণ তবে উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব সাত বছর এবং সর্বনিম্ন দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন।’



২. অ্যাসিড অপরাধ দমন আইন-২০০২ : এসিড অপরাধ দমন আইনে অ্যাসিড দ্বারা মৃত্যু ঘটানো, এসিড দ্বারা আহত করা, অ্যাসিড নিক্ষেপ করা বা নিক্ষেপের চেষ্টা করা এবং এ অপরাধে সহায়তা করা প্রভৃতির শাস্তি, বিচার পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অ্যাসিড দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি : যদি কোনো ব্যক্তি অ্যাসিড দ্বারা অন্য কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন।

অ্যাসিড দ্বারা আহত করার শাস্তি : এই আইনে আরও বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি অ্যাসিড দ্বারা কাউকে এমনভাবে আহত করেন যে- ক. তার দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হয় বা মুখমণ্ডল বিকৃত বা নষ্ট হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন। খ. শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় বা শরীরের কোনো স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বছর কিন্তু অনূন্য সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন। এছাড়া এসিড নিক্ষেপ করা বা নিক্ষেপের চেষ্টা বা অপরাধে সহায়তা করার জন্যও শাস্তির বিধান রয়েছে। অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ আইনে সরকার অ্যাসিডের মজুদ, বহন, আনা-নেওয়া ব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ২০১০ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন-২০১০ পাস হয়।

৩. নারী ও শিশুপাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশের আইন : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এ বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনি বা নীতিগর্হিত কোনো কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোনো নারী বা শিশুকে বিদেশ থেকে আনয়ন করেন বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে কোনো নারী ও শিশুকে তার দখলে বা হেফাজতে রাখেন তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ বছর কিন্তু অনূন্য ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন। এছাড়াও নারী ও শিশু অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, যৌনপীড়ন, যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো ইত্যাদির ক্ষেত্রে আইনে শাস্তির বিধান রয়েছে।

কাজ			
দ্রুতত: নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত আইনের বিধানে শাস্তি উল্লেখ করে নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব চিহ্নিত কর।			
আইন	বিধানাবলি	শাস্তি	দায়িত্ব ও কর্তব্য
যৌন হয়রানি			
এসিড নিক্ষেপ			
নারী ও শিশু পাচার			

মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২- এ মানবপাচারের জন্য দায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডসহ পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সমাজের করণীয়

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজের করণীয় কী তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. নারীশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ, বিধবা ভাতা প্রদান এবং নারীর জন্য ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি;

২. নির্যাতন, সহিংসতার ধরন ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন প্রণয়ন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ;
৩. পরিবারে ছেলেমেয়ে উভয়কেই পারিবারিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ গঠন সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান;
৪. নারী অধিকার এবং অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি;
৫. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মতৎপরতার সম্প্রসারণ;
৬. নারী নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা;
৭. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রবর্তিত আইন, যেমন-অ্যাসিড অপরাধ দমন আইন, অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, যৌতুক প্রতিরোধ আইন, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, বাল্যবিবাহ অধ্যাদেশ, সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ ইত্যাদির যথাযথ প্রয়োগ;
৮. সামাজিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করা;
৯. নারীর বিরুদ্ধে সহিংস ঘটনার প্রভাব ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার করে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি;
১০. নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট আইনের বিষয়বস্তু সহজভাবে জনসমক্ষে উপস্থাপন ও প্রচার।

কাজ  
দলপত: যৌন হয়রানি বশেষে তুমি কী  
ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার?  
উল্লেখ কর।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আরও কতকগুলো বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজে মূল্যবোধের পরিবর্তন বোঝা, নারী ও পুরুষের স্বাধীন সম্পর্ক গড়ে তোলা, সুস্থ পরিবার গঠন, শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ অনুশীলন করা, নারীর ভূমিকা ও মর্যাদার যথাযথ মূল্যায়ন করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সামাজিক চাপ প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন-গ্রাম আদালত, ইউনিয়ন পরিষদ প্রভৃতিকে অধিক সক্রিয় করতে হবে। নারীর প্রতি সহিংস ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধী কিংবা অপরাধীর পরিবারের তরফ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়, অপরাধীকে সামাজিকভাবে বয়কট করে এক ঘরে করে রাখা প্রভৃতি সামাজিক চাপসংক্রান্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে সহিংস ঘটনা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। অপরাধীকে ধুঁজে বের করার ক্ষেত্রেও অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক চাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

## শিশুশ্রম

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রম আছে। যে বয়সে একটি শিশু স্কুলে যাওয়া আসা করবে, সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করবে ঐ বয়সে দরিদ্র শিশুদের জীবিকার জন্য কাজ করতে হয়। বাংলাদেশে শিশুশ্রমের প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো-অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে ভরণ-পোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগানো বাবা-মার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে তাদের স্কুলে পাঠাতে অতিভাবকরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় পিতা বা মাতা মনে করেন, সন্তান কোনো পেশায় নিয়োজিত হয়ে আয় রোজগার করলে পরিবারের উপকার হবে। শিশুদের অল্প



শিশুশ্রম



পারিশ্রমিকে দীর্ঘকাল কাজে খাটানো যায় বলে নিয়োগ কর্তারাও তাদেরকে কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহী হয়। দরিদ্র পিতা-মাতা শিক্ষাকে একটি অলাভজনক কর্মকাণ্ড মনে করে। সন্তানদের ১৫-১৬ বছর ধরে লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাওয়ার মতো ধৈর্য ও অর্থ তাদের থাকে না। শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের উদাসীনতায় শিশুশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরজীবনে গৃহস্থালি কাজে গৃহকর্মীর ওপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীলতাও শিশুশ্রমকে উৎসাহিত করছে।

## শিশুশ্রম প্রতিরোধে বাংলাদেশের আইন ও বাংলাদেশ অনুসমর্থিত আন্তর্জাতিক সনদসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুদের অধিকার : বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬-এ শিশু ও কিশোরদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে শিশুর ন্যূনতম বয়স ১৪ বছর এবং কিশোরের ন্যূনতম বয়স ১৪ থেকে ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া আইনে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৪ বছরের কম বয়সী কোনো শিশুকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না এবং শিশুর পিতামাতা কিংবা অভিভাবক শিশুকে দিয়ে কাজ করানোর জন্য কারও সাথে কোনো প্রকার চুক্তি করতে পারবে না। কিশোর শ্রমিক নিয়োগ করতে হলে রেজিস্টার্ড ডাক্তারের কাছ থেকে মালিকের খরচে ফিটনেস সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। কিশোর শ্রমিকদের স্বাভাবিক কাজের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে দৈনিক ৫ ঘণ্টা। তবে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ভোর ৭টা পর্যন্ত কোনো কিশোর শ্রমিককে দিয়ে কাজ করানো যাবে না। কিশোর শ্রমিককে দিয়ে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বা বিপজ্জনক কাজ করানো যাবে না। পাশাপাশি এ আইনে আরও বলা হয়েছে যে, ১২ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের কেবল সে ধরনের হালকা কাজই করানো যাবে যে কাজে কোনো ক্ষতি হবে না এবং যা তাদের শিক্ষা গ্রহণের অধিকারকে বিঘ্নিত করবে না।

জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০-এ শিশুশ্রম বিলোপ সাধনে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নির্মূলে কৌশলগত ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত হতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে সুনির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সব ধরনের শিশু শ্রম বিলোপে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কাজ  
দলগত : শিশু শ্রম বন্ধে তোমাদের কী  
করণীয় উল্লেখ কর।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ : ১৯৮৯ সালের জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে শিশুশ্রম বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সনদে বলা হয়েছে, স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে সদস্য রাষ্ট্রগুলো শিশু শ্রমের জন্য বয়স, বিশেষ কর্মঘণ্টা ও কর্মে নিয়োগের যথার্থ শর্তাবলি নির্ধারণ করবে। এছাড়া এ সনদে শিশুর সুরক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে যা পরোক্ষভাবে শিশুশ্রম নিরসনে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে এ সনদ অনুসমর্থন করেছে।

## কিশোর অপরাধ

কিশোর অপরাধ প্রতিটি সমাজের জন্য একটি উদ্বেগজনক সামাজিক সমস্যা। আমাদের সমাজে এবং পৃথিবীব্যাপী উল্লেখযোগ্য হারে সমস্যাটি বিদ্যমান রয়েছে। সামাজিক সুষ্ঠু পরিবেশ ও মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়ে খারাপ সজ্জা এবং পাচারকারী ও বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে জড়িত হয়ে শিশু-কিশোররা অপরাধী হয়ে ওঠে।



শিশুরা জাতির মূল্যবান সম্পদ। সুতরাং তাদের উন্নয়নের জন্য এবং সমসুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকে। কর্মক্ষম ও নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সমাজের প্রয়োজনে উপযুক্ত দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা অর্জন করতে পারে। বঞ্চিত ও অবহেলিত শিশু-কিশোররা সহজেই অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ে। কাউকে পরোয়া না করা, কিম্বদন্তির অভাব, উদ্যম, শারীরিক শক্তি এবং টিকে থাকার ক্ষমতা, দুঃসাহসিক প্রকৃতি প্রভৃতি কারণে কিশোররা অপরাধ ও বিভিন্ন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পারিবারিক অভাব-অনটন, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং বাবা-মায়ের ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে সুবিধা বঞ্চিত হওয়ায় শহরের বসতিতে বসবাসকারী কিশোররা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে বেশি জড়িয়ে পড়ে। এছাড়া শহর জীবনের একাকিত্ব, বাবা-মায়ের কর্মব্যস্ততা, মোবাইলের মাধ্যমে অনিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ ইত্যাদি নানা কারণে কিশোররা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়। গঠনমূলক পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি, পরিবার ও বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, চিন্তাবিনোদনমূলক কার্যক্রম, প্রভৃতি পদক্ষেপের মাধ্যমে কিশোর অপরাধ মোকাবিলা করা যেতে পারে। আবার যেসব শিশু ও কিশোর ইতোমধ্যেই অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে তাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত, কিশোর হাজত, সংশোধনী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

**কিশোর অপরাধ দমন আইন এবং বিচার ব্যবস্থা :** কিশোর অপরাধের বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সাজা দেওয়া নয় বরং তারা যেন তাদের ভুলগুলো উপলব্ধি করে সংশোধন হওয়ার সুযোগ পায়।

**কিশোর অপরাধী :** জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু বলে বিবেচিত। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে এ সনদ অনুমোদন করে। বাংলাদেশের শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী অনুর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বছর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য হবে।

এই আইনে কিশোর অপরাধের বিচারের জন্য পৃথক আদালত গঠন, তাদেরকে রাখার জন্য পৃথক হাজত বা আবাসন এবং তাদের সংশোধনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়।

#### কাজ

দলগত : কিশোর অপরাধীকে সুপথে আনার জন্যে কল্পনীয় পদক্ষেপ চিহ্নিত কর।

প্রত্যেক জেলা সদরে শিশু আদালত নামে এক বা একাধিক আদালত থাকে। কিছু কিছু অপরাধ খতিয়ে দেখতে বিচারের শুনানি এবং নিষ্পত্তির জন্য শিশুদের প্রায়শই আটক রাখার প্রয়োজন হয়। এ সময় তদন্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আটক শিশুকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিশুর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে অপরাধ সংঘটনের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। এই কর্মকর্তারা বিচার, বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে এবং অভিভাবকদের তথ্য অনুযায়ী আদালতে রিপোর্ট পেশ করবেন। শিশু আইনে শিশুদের সংশোধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইন অনুযায়ী যারা অভিযুক্ত ও দোষী শিশু এবং যাদের আনুষ্ঠানিক সংশোধন প্রয়োজন তাদেরকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে।

### মাতৃকল্যাণ

স্বাস্থ্য একটি মানবাধিকার। সকল জনগণের সুস্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে সেবা প্রাপ্তিতে সাম্য, নারী-পুরুষ সমতা এবং সমগ্র জনগোষ্ঠীর সেবার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে মায়ের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এককথায়, মাতৃকল্যাণ বলতে মায়ের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং ভালো থাকার জন্য সমাজ এবং সামাজিক সংগঠন কর্তৃক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাসমূহকে বোঝায়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য সেবা, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও

পুষ্টি চাহিদা পূরণ, নিরাপদ প্রসূতি সেবা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর উপস্থিতি ও পরিচর্যা, প্রজননকালীন রক্তাভা, মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার রোধ প্রভৃতি মাতৃকল্যাণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।

মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে মাতৃত্বজনিত মৃত্যু নারীদের বাঁচার ও স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকারকে মারাত্মকভাবে আঘাত হানে। বাংলাদেশে সার্বিক মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য পরিস্থিতি উন্নতির পথে। তবে মাতৃত্বজনিত কারণে এখনও অনেক প্রসূতি মা মারা যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির অন্যতম লক্ষ্য শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা। এ লক্ষ্যে সরকার মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যথাসম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহীত হচ্ছে। মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ সরকার ১১ জানুয়ারি ২০১১ গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত নারী কর্মীদের জন্য ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ঘোষণা করে, যা ৯ জানুয়ারি ২০১১ সাল থেকে কার্যকর হয়। মাতৃত্বজনিত ছুটি বৃদ্ধির ফলে মায়েরা তাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করাতে সমর্থ হবেন এবং এর ফলে নবজাতক শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর হবে। তবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এখনও ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত হয়নি।

## পরিচ্ছেদ ১৫.৩: সড়ক দুর্ঘটনা

### সড়ক দুর্ঘটনা পরিস্থিতি

সড়ক দুর্ঘটনা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ঘটে থাকে। তবে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার পরিস্থিতি ভয়াবহ। বাংলাদেশের সমাজ জীবনে এ সমস্যা নানামুখী আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এটি মানসিক সমস্যাকেও প্রভাবিত করেছে। চালক, মালিক, ট্রাফিক পুলিশ এবং রাস্তার জট ও দুর্বলতাজনিত সড়ককেন্দ্রিক যে দুর্ঘটনা তা-ই সড়ক দুর্ঘটনা। বাংলাদেশে রাস্তাঘাট ও যানবাহন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্ঘটনার হার অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলেছে। সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের সংখ্যা।

প্রকৃতপক্ষে সড়ক দুর্ঘটনা পরিস্থিতি ভয়াবহ। দৈনিক খবরের কাগজে চোখ রাখলেই সড়ক দুর্ঘটনার তথ্যবহতা সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারব এবং জানতে পারব এ সমস্যার পেছনে রয়েছে বহু কারণ, যার প্রভাবও বহুমুখী।

### সড়ক দুর্ঘটনার কারণ

বাংলাদেশের শহরে গাড়ির সংখ্যা যে হারে বেড়েছে সে হারে দক্ষ চালক তৈরি হয়নি। অদক্ষ ও প্রশিক্ষণবিহীন চালককে দিয়ে গাড়ি চালানোর কারণে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। গাড়ি চালানোর জন্য যে সকল আইন ও নিয়মনীতি রয়েছে তাও অধিকাংশ গাড়ি চালকরা জানেন না। এ কারণে তারা কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে অনেকেই কম বেতনে সনদবিহীন চালক নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এসব চালক অধিকাংশই তরুণ যারা রাস্তায় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় অন্য গাড়িকে ওভারটেক করে এবং বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে থাকে। এ কারণেও প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনা বাড়ছে।



আমাদের দেশে অধিকাংশ ট্রাক চালক গাড়িতে পরিবহনসীমার অতিরিক্ত মাণ বোঝাই করেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাপি ট্রাকে যাত্রী বোঝাই করে গন্তব্যে পৌঁছান। শোভাযাত্রা, মিছিল এবং শিক্ষার্থীরা দলেবলে যাওয়ার জন্য ট্রাক ব্যবহার করে, যা অনেক সময় দুর্ঘটনায় পতিত হয়। আমাদের দেশে ট্রাক চালকদের একটি অংশ নেশায় আসক্ত। দূরপাল্লার পরিবহনে এসব চালকরা অনেক সময় নেশাখাস্ত হয়ে গাড়ি চালান। এ কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক সময় দেখা যায় যাত্রী পরিবহনে আসন সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত যাত্রী, এমনকি গাড়ির ছাদেও যাত্রী বহন করা হয়। এর ফলে অনেক গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হয়।

অনেক সময় স্বল্পশিক্ষিত গাড়ির মালিকগণ অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশায় চালকদের হাতে চলাচলের অযোগ্য ও ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি তুলে দেন। তাছাড়া হালকা বডিগার গাড়ি অনেক ক্ষেত্রে মহাসড়কে চলতে দেখা যায়। এ কারণেও দুর্ঘটনা বেড়ে যায়।

আমরা অনেকেই সড়ক ব্যবহার করার নিয়মনীতি জানি না। রাস্তার কোন পাশ দিয়ে চলতে হবে, কখন পারাপার হতে হবে প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। উদাসীন ব্যক্তি, শিশু, বৃদ্ধ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ অনেক সময় অসতর্কভাবে রাস্তায় চলাচল করেন। কেউ কেউ মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে পথ চলেন। এরূপ নানাবিধ অনামনকতা ও অসতর্কতা অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটায়।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যথাযথ পদক্ষেপ প্রয়োজন যাতে প্রশিক্ষিত লাইসেন্সধারী চালক গাড়ি চালায় ও যান্ত্রিক ত্রুটিহীন গাড়ি রাস্তায় থাকা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

রাস্তার উপর হাটবাজার স্থাপন, নির্মাণসামগ্রী রাস্তায় রাখা, মহাসড়কে ধান, পাট, মরিচ শুকানো, গরু-ছাগল বেঁধে রাখা, একই রাস্তায় গাড়ি, অযান্ত্রিক যান এবং পথচারী চলাচল করার কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক পথচারীর জেব্রাক্রসিং এবং ওভারব্রিজ দিয়ে রাস্তা পারাপার না হওয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে।

চলন্ত অবস্থায় গাড়িচালকের সাথে কথা বলা, প্রতিযোগিতা করে গাড়ি চালানো, রাস্তায় গাড়ি বের করার পূর্বে যান্ত্রিক ত্রুটি পরীক্ষা না করা, সিটবেল্ট ও হেলমেট ব্যবহার না করা, অধিক রাতে গাড়ি চালানো এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কারও কারও দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে।

আমাদের দেশে কোনো কোনো সড়কের নক্সা এবং নির্মাণে ত্রুটি রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার এবং কন্সট্রাক্টরের কাজে উদাসীনতা এবং নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি এ সমস্যার জন্য দায়ী। ত্রুটিপূর্ণ সড়কের কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

## সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব

সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে খুবই মারাত্মক, যা আবার বহু সমস্যার জন্ম দেয়। হাইওয়ে পুলিশ বিভাগের প্রকাশিত প্রতিবেদনের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিদের ২৪% লোকের বয়স ১৫ বছরের নিচে এবং ৩৯% লোকের বয়স ১৬-৫০ বছরের মধ্যে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান শিকার হচ্ছে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দুর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহত হওয়ার কারণে এসব পরিবারের সদস্যদের দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয় এবং আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ পরিবারের শিশুদের শিক্ষা ব্যাহত হয়।

### কাজ

দলগত : সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রভিত্তিক কারণের একটি ছক তৈরি কর।

চালক	মালিক	সড়ক	অন্যান্য

### কাজ

একক : একটি শিশুর জীবনে সড়ক দুর্ঘটনা পরিবারিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

দলগত : 'সড়ক দুর্ঘটনা শুধু পারিবারিক জীবনকেই বিপর্যস্ত করে না আর্থ-সামাজিক ও মানসিক জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে' -ব্যাখ্যা কর।

অনেক সময় দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তি শারীরিকভাবে পঙ্গু হলে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, যা তার ব্যক্তি জীবনকে ভারসাম্যহীন করে তোলে। মানসিক ভারসাম্যহীনতা ব্যক্তি জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এ সমস্যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মহত্যা রূপ নেয়। আবার দেখা যায় পঙ্গু ব্যক্তিটিকে ভিক্ষাবৃত্তির মতো পেশা গ্রহণ করতে। কেউ কেউ জীবন নির্বাহের জন্য অপরাধ জগতে প্রবেশ করে। চরম হতাশা লাঘবে অনেকে আবার মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং, সড়ক দুর্ঘটনা শুধু ব্যক্তির পারিবারিক জীবনকেই বিপর্যস্ত করে না, আর্থ-সামাজিক ও মানসিক জীবনকেও দুর্বিসহ করে তোলে।

সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাংচুর, সড়ক অবরোধসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। অনেক সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র ক্ষতির সম্মুখীন হয়। চাকরিজীবীর কর্মঘণ্টা অগচয় হয়। পরিবহনের অভাবে কঁচামাল নষ্ট হয়। গন্তব্যে মালপত্র পরিবহন ক্লিষ্ট হলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঘটে। চিকিৎসাসহ জরুরি প্রয়োজন বাধাগ্রস্ত হয়। এ বিষয়ে আমরা প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকার চোখ রাখলে আরও ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করতে পারব।

### সড়ক দুর্ঘটনামুক্ত রাখার উপায় এবং দুর্ঘটনা হ্রাসের পদক্ষেপ

বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশেই কমবেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে আমরা সড়ককে নিরাপদ ও দুর্ঘটনামুক্ত রাখতে পারব।

- চালক নিয়োগের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ যোগ্যতা নির্ধারণপূর্বক নিয়োগ দেওয়া;
- গাড়ির চালককে ট্রাফিক আইন-কানুন ও নিয়মশৃঙ্খলা মেনে গাড়ি চালাতে উদ্বুদ্ধ করা এবং সাইড, সিগন্যাল, গতি মেনে সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে গাড়ি চালককে উৎসাহিত করা;
- বেপরোয়া ও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি না চালানো, গাড়িতে অতিরিক্ত যাত্রী ও মাল পরিবহন না করা, অন্য গাড়িকে ওভারটেকিং না করার বিষয়ে চালকদের সচেতন এবং আইন মানতে উদ্বুদ্ধ করা;
- ভারী যানবাহন চলাচলের জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা করা;
- সকল সিগন্যাল পয়েন্টে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল স্থাপন করা;
- আধুনিক ও মানসম্মত ড্রাইভিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা;
- বুকিংপূর্ণ রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করে সড়ক নিরাপদ করার পদক্ষেপ গ্রহণ;
- গাড়ির ছাদে যাত্রী এবং মালপত্র বহন না করা;
- প্রতিযোগিতা করে গাড়ি না চালানো;
- রাস্তায় গাড়ি বের করার পূর্বে যান্ত্রিক ত্রুটি পরীক্ষা করে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব পালনে সচেতন করা;
- জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমকে ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা;
- দূরপাল্লার সড়কের পাশে বাড়িঘর তৈরি এবং হাটবাজার স্থাপন না করা। তাছাড়া সড়কে ধান, পাট, মরিচ শূকাত না দেওয়া এবং গরু-ছাগল না বাঁধা;
- ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্বশীল হওয়া; ভুয়া লাইসেন্সধারী কেউ যাতে রাস্তায় গাড়ি চালাতে না পারে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্বশীল করা;
- রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে অ্যালকোহল বা মাদক গ্রহণকারী গাড়ি চালকদের শনাক্ত করা এবং তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রত্যাহার করা।

#### কাজ

একক : শিশু-কিশোরদের দুর্ঘটনা প্রতিরোধের পদক্ষেপ চিহ্নিত কর।  
একক : তেমার এলাকার সড়ক নিরাপদ রাখার পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত কর।



### নিরাপদ চলাচলের জন্য করণীয়-

- ফুটপাথ দিয়ে চলাচল করা, দৌড়ে রাস্তা পার না হওয়া, চলন্ত গাড়িতে ওঠা-নামা না করা, চলন্ত অবস্থায় গাড়ি চালকের সঙ্গে কথা না বলা এবং জেব্রাক্রসিং, ওভারব্রিজ ও মাটির নিচের সংযোগ পথ তথা আভার পাস দিয়ে রাস্তা পারাপার হওয়া;
- শিশু-কিশোরদের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে তাদের মহাসড়ক, সংযোগ সড়ক ও আধাপাকা সড়ক সম্পর্কে পরিচিত করানো। তাছাড়া চলাচলের জেব্রাক্রসিং, পারাপার সেতু, ট্রাফিক পুলিশ, ফুটপাথ, ট্রাফিক বাতি ও চিহ্নবানি, বিপজ্জনক স্থান প্রভৃতি সম্পর্কে পরিচিত করানো;
- ছোটো ভাইবোনদের নিরাপদ চলাচল বিষয়ে আমরা সচেতন করব। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও প্রবীণদের নিরাপদ চলাচলে সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সড়ক দুর্ঘটনার শিকার এমন পরিবারের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত এবং সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া কর্তব্য।

### পরিচ্ছেদ ১৫.৪ : দুর্নীতি

#### দুর্নীতির ধারণা

ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধ পন্থায় নীতি-বহির্ভূত বা জনস্বার্থবিরোধী কাজই দুর্নীতি। রাজনৈতিক এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভের জন্য কার্যালয়ের দায়িত্বের অপব্যবহারকে বুঝায়। সাধারণত ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, বলপ্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন, প্রভাব খাটানো এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনের ক্ষমতা অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনকে দুর্নীতি বলে। অবৈধ সুযোগসুবিধা লাভের জন্য কোনো ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলাও দুর্নীতি। দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকে পেশা, ক্ষমতা, পদবি, স্বার্থ, নগদ অর্থ, বস্তুসামগ্রী প্রভৃতি। দুর্নীতির মাধ্যমে কাউকে না কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এ অপরাধের প্রকৃতি ও কলাকৌশল জালান্দা। এ কাজে দৈহিক শ্রমের চেয়ে ধূর্ত বুদ্ধির প্রয়োজন বেশি।

#### দুর্নীতির কারণ

বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণ বহুবিধ। মূলত লোভ ও উচ্চাভিলাষী মনোভাব ব্যক্তিকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে। অনেক চাকরিজীবী দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে অতিরিক্ত আয়ের চেষ্টা করে। তারা ফাইলের কাজের বিনিময়ে ঘুষ, বকশিশ, কমিশন, চা-নাস্তা বাবদ খরচ, দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি আদায় করে থাকে। কখনো এসব দুর্নীতিবাজরা দাপ্তরিক ফাইল আটকিয়ে ঘুষ গ্রহণ করে। আবার অনেক সময় অফিসের প্রধান কর্তার টেবিলে দীর্ঘদিন নানা কারণে ফাইলবন্দি হওয়ার কারণে অধস্তন কর্মচারী এ সুযোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ফাইলবন্দি করাও দুর্নীতি। অফিসের প্রধান বা শাখাপ্রধান দুর্নীতিবাজ হলে এর প্রভাব সংশ্লিষ্ট সকল শাখায় সংক্রমিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীকে বিলাসী জীবন বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার নেশা ও স্বল্পসময়ে অধিক সম্পদের মালিক হওয়ার প্রত্যাশা দুর্নীতিবাজে পরিণত করে। এদের বৈধ উপার্জনের সাথে জীবনযাত্রার মানের মিল থাকে না। এসব পরিবারের সদস্যদের চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধে দুর্নীতি মিশে থাকে। পরবর্তী জীবনে এরাও দুর্নীতিবাজে পরিণত হয়। এদের অনেকের চাকরি জীবন শুরু হয় অন্য এক দুর্নীতিবাজের মাধ্যমে।

রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অভাব, অগণতান্ত্রিক পন্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দুর্নীতি বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

#### কাজ

একক : একটি অফিস বেছে নাও এবং উক্ত অফিসে কতভাবে দুর্নীতি হতে পারে তার একটি চিত্র তুলে ধর।

একক : দুর্নীতি প্রতিরোধে গড়ে ওঠা একটি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত কর এবং এ প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য দুর্নীতির চিত্র তুলে ধর।

দলগত: পারিবারিক জীবনে দুর্নীতির প্রভাব চিহ্নিত কর এবং প্রতিরোধ পদক্ষেপ লিখ।

সাধারণত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে অনেক সময় ব্যবসায়ী, আড়তদার, মণ্ডলুদার, মুনাফাখোর, মধ্যস্বত্বভোগী, ফটকা কারবারীরা দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলে। তারা প্রতারণা ও দুর্নীতির মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করে। এর ফলে স্বল্প আয়ের লোকেরা অর্থকষ্টের কারণে বাঁচার তাগিদে দুর্নীতির আশ্রয়গ্রহণ করে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান যখন দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যর্থ হয় কিংবা এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে তখন সমাজ ব্যাপকভাবে দুর্নীতিতে ছেয়ে যায়। দুর্নীতিপূরণ ব্যক্তি শাস্তি না পাওয়া দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে।

### দুর্নীতির প্রভাব ও প্রতিরোধ

সমাজ জীবনে দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যে সমাজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে সে সমাজে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। দুর্নীতিবাজ ও অন্যের দুর্নীতির শিকারে পরিণত হয়। ন্যায্য অধিকারের বঞ্চিত দুর্নীতিপ্রবণ সমাজের চিত্র। চাকরিজীবনে স্বজনপ্রীতি বা ঘুষের বিনিময়ে যদি অযোগ্যরা নিয়োগ এবং পদোন্নতি পায় তাহলে সমাজের যোগ্যরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দুর্নীতির কারণে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়। মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে, ফলে যোগ্যদের প্রতিভা বিকশিত হয় না। স্বজনশীলতা ক্রমশ হ্রাস পায়। দুর্নীতিপ্রবণ সমাজে আইন-শৃঙ্খলা, নিয়ম-কানুন প্রভৃতির প্রতি মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক আন্দোলন। গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যকর হাতিয়ার হলো গণমাধ্যম। গণমাধ্যমে দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য প্রচার করে গণসচেতনতা গড়ে তোলা সম্ভব। সমাজের সর্বস্তরে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা হলে দুর্নীতি নির্মূল করা যায়। উপার্জন, ব্যয়, সম্পদের হিসাব প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমেও অনেক দুর্নীতিবাজদের মুখোশ খোলা সম্ভব। দুর্নীতিবাজ, নকলবাজ, প্রতারক ও মুখোশধারীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনলে দুর্নীতি উচ্ছেদ সহজতর হবে। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক আন্দোলন কর্মসূচি প্রভৃতির মাধ্যমেও দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব। তাছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটলে সমাজ থেকে দুর্নীতির অবসান ঘটবে।



## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কীভাবে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারে?
২. 'সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
৩. পাচারকৃত নারী ও শিশু কীভাবে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে?
৪. উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক সেবাহীনতার দাস্তরিক ফাইল আটকানোকে দুর্নীতি বলা হয় কেন?

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. 'সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির মূল কারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙন' - কথাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
২. 'সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয় পরস্পর সম্পর্কিত ধারণা' - দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর।
৩. 'উপার্জনক্ষম ব্যক্তিই সড়ক দুর্ঘটনার অধিক শিকার' - কথাটি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১১ অনুযায়ী মানব পাচারের জন্য দায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তির সর্বোচ্চ শাস্তি নিচের কোনটি?
  - ক. সশ্রম কারাদণ্ডসহ দুইলক্ষ টাকা অর্থদণ্ড
  - খ. মৃত্যুদণ্ডসহ পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড
  - গ. বিনাপ্রশ্রম কারাদণ্ডসহ পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড
  - ঘ. মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
২. শৈশবে নারীর প্রতি বঞ্চনার অভিজ্ঞতা একজন পুরুষকে সহিংস করে তোলে, এর মূল কারণ হলো-
  - ক. দ্রুতপূর্ণ সামাজিকীকরণ
  - খ. মূল্যবোধের অবক্ষয়
  - গ. গোঁড়ামি
  - ঘ. আধিপত্য

৩. সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ হলো—

- i. দারিদ্র্য      ii. সামাজিক কুপ্রথা      iii. সামাজিক বিশৃঙ্খলা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii      খ. i ও iii      গ. ii ও iii      ঘ. i, ii ও iii

নিচের ঘটনাটি পড় এবং ৩ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

পিতামাতার পারিবারিক দ্বন্দ্ব, ঋণভা-বিবাদ, মারামারির মধ্যে লিমনের বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে। একপর্যায়ে পিতামাতার বিবাহ বিচ্ছেদের পর সে একাই বড়ো হয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যেও সে একই আচরণ লক্ষ্য করেছে। নিজের বিয়ের পরে তার সংসারেও প্রতিদিন একই ঘটনা ঘটছে। লিমনের পরিবার এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হয়েছে।

৪. স্ত্রীর প্রতি লিমনের সহিংস আচরণের মূল কারণ কী?

- ক. যৌতুক প্রাপ্তির বাসনা  
খ. চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হওয়া  
গ. পাড়া-প্রতিবেশীর প্রভাব  
ঘ. শৈশবে বঞ্চনার অভিজ্ঞতা

৫. লিমনের পরিবারের জন্য সমাজকর্মী যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন, তা হলো—

- i. সুস্থ পরিবার গঠন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ  
ii. প্রচলিত আইন সম্পর্কে সচেতন করা  
iii. আইনরক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii      খ. i ও iii      গ. ii ও iii      ঘ. i, ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. 'ক' দেশের অফিস-আদালতে নাগরিকদের সেবা পেতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। কোন ধরনের আর্থিক বিনিময় ছাড়া সেবাগ্রহীতা নাগরিকরা সেবা পাচ্ছে না। ফলে নানা জটিলতা তৈরি হচ্ছে।

ক. সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপ কী?

খ. মূল্যবোধের অবক্ষয় বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত ঘটনায় কোন সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে উক্ত সমস্যার প্রভাব মূল্যায়ন কর।